নতুন বছরের তালপাতার ভেপুঁ

মৈত্রেয়ী কুমার

Online version:
https://bongdhong.com/2016/04/14/bengali-new-year-নতুন-বছরের-তালপাতার-ভেপ/

পান্তা ভাত, সর্ষে ইলিশ, শুঁটকি মাছের শুকনা, পেঁয়াজ-লঙ্কা আর আচার! এই ছিল আমার মায়ের ছেলে বেলার পয়লা বৈশাখীর ডেলিকেসী। শুনেছি আমার দিদার রান্নার হাতখানি ছিল জস্পেশ। পাড়া পড়শি আত্মীয় বন্ধু 'হগ্গলেই চাইট্যা পুইট্যা খাইয়া যাইতো মায়ের রান্না,' খুব গর্বিত সুরে বলছিল আমার মা।

এবার নববর্ষে আমি নর্থপোলের মুণ্ডদেশ ডেনমার্কেই কাটাবো। মায়ের জন্য স্বভাবতঃই মনটা উচাটন। একলা মানুষ! দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে মার সাথে ফোনে গল্প জুড়লাম। 'কি করতে মা তোমরা ছেলেবেলায় পয়লা বৈশাখে?'

'করুম আার কি?' বলে কথা শুরু করলেও পাক্কা দশ মিনিট ধরে মা স্মৃতিচারণ করে গেল। বেশ লাগছিল কিন্তু শুনতে। ভাবলাম, মায়ের ফেলে আসা পুরনো সেই দিনের কথা আজ নতুন বছরের আলোর প্রভাতে সবার সঙ্গেঁ মিলেমিশে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলে কেমন হয়!

মায়ের জন্মগ্রাম খুলনা। বর্ধিষ্ণু শহর। অবস্থাপন্নদের ঘর। ধান জমি, আম বাগান, মাছ ভরা পুকুর প্রায় সব বাড়িতে। মেঘনা নদী বুক চিতিয়ে তার ঘোর কালো জল নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বুক সমান উঁচু উঁচু ঢেউ। বর্ষায় তাকালে গা ছমছম করে। মায়ের বাবা, অর্থাৎ আমার দাদু, ছিল স্থানীয় স্কুলের মাস্টারমশাই। হিন্দু-মুসলমানরা তখন সত্যিই 'এক বৃন্তে দুইটি কুসুম'-এর মতনই ছিল। দাদুর অনেক মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশের পর নিজেদের বাগানের ইয়াব্বড় আম হাতে প্রণাম করতে আসতো। 'হগ্গলের হাতে হাতে মণ্ডা দিতো মা।'

দিদা নাকি অসম্ভব ভালো কচ্ছপের মাংস রাঁধতো। তুলোর মতন তুলতুল করতো সেই মাংস। তখনকার দিনে তরি-তরকারি আর মাছ মাংসের বাজার ছোঁয়া-ছুঁয়ি করা হত না। বেতের ডুলুই (চারকোনা ঝুপড়ি)-তে করে বছরকার প্রথম দিনটায় দাদু আনতো নদীর টাটকা মাছ। কচ্ছপের মাংস। হাঁসের ডিম আর লালমোহনের হাঁড়ি।

মা আহ্লাদী হেসে বললো, 'আমাগো ভাইবুনদের পরণের নূতন কাপড় বাবামশায় গঞ্জের হাট থিক্যা আনতেন। সেই কাপড় পইর‍্যা ইস্কুল যাইতাম ভোরে। আহা! আমাগো ইস্কুলবাড়ি আছিলো দ্যাখবার মতোন। বিঘা তিনেক জমির উপর বাড়ি। আমাগো পড়শি এক মুসলমানের মাইয়্যা তিনডিও পড়তো। বড়ডিরে মা সরস্বতী সাজাইয়াছিলো একবার। পরণে হালকা হালকা হলুদরঙা পাড়ওয়ালা কাপড়, হাতে বীণা। ঘণ্টা ধইর‍্যা মাইয়্যা বইস্যা আসে ঠিইক ঠাকুরাইনডির মতোন। দেহ, হাইত-পা কিস্যু নড়ে না।'

মার স্মৃতিকথার এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে । ‘আমাগো ইস্কুল থিক্যা প্রভাতফেরি বাইরাইতো। পোলারা ধুতি পাঞ্জাবী, মাইয়্যারা সাদা শাড়ি, পাইড় লাল। “এসো হে বৈশাখ” রবি ঠাকুরের গান গাইয়া হগ্গলে যাইতাম মেঘনার তীরে। বাবাগো! কি ভিড়! হগ্গলে জড়ো হইসে নূতন বছরের নূতন সূর্য্য দ্যাখবার লগে।’

শুনে তো আমি চমৎকৃত। কি সুন্দর ভাবনা! নতুন বছরে নতুন সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে নতুন অঙ্গীকার। মায়েদের ইস্কুলে ঐ দিন প্রভাতফেরির পরে হত কত রকম খেলা, কসরৎ আর ব্রতচারী নাচ। সাদা সূতীর পোষাক, কোমরে লাল কাপড় বাঁধা আর জোড়া লাঠি হাতে গোল করে দাঁড়িয়ে মেয়েরা নেচে নেচে গাইতো —

“চল কোদাল চালাই।
ভুলে মানের বালাই ।।
ঝেড়ে অলস মেজাজ।
হবে শরীর ঢালাই।।”

তারপর হৈ হৈ করে ছুটত সব বৈশাখী মেলা মাঠে। সেখানে তখন রং তামাশা আর খুশীর ছররা ছুটেছে। কোথাও ছোরাখেলা, লাঠিবাজি তো কোথাও মোরগ লড়াই। ত্রিপল খাটানো এক কোণে বাঁশের প্যাণ্ডেল থেকে ভেসে আসছে মন কেমন করা বাউল, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা গান। বুড়ো বুড়িরা নাকে তিলক কেটে মালা হাতে গুটি গুটি জড়ো হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের পালাকেত্তন আসরে। কীর্তনীয়া ঢাউস নোলক নেড়ে সবে ধরেছে পদাবলীর রাসলীলার গান। রং বেরঙের মাটির ভাঁড় নিয়ে বসেছে কুমোরের দল। দিদা বলে দিয়েছে একখান কিনতে। দু পাঁচ পয়সা করে সোমবচ্ছর জমাবে রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে রেখে। মার নজর কিন্তু ডুগডুগি বাজিয়ে যে মুসলমান ছোকরা পায়রার দৌড় করাচ্ছে, তার দিকে। তাছাড়া বেলা ঢলার আগে চাপতে হবে নাগরদোলা। এখনো বরফ চুষি আর পাঁপড় খাওয়া বাকি। তারপর বন্ধুদের সাথে আইকম-বাইকম খেলা আছে, পাখিদের খাঁচায় ঢুঁ মারা আছে। সব সেরে মাটির ভাঁড় বগলে, তলতা পাতার ভেঁপুতে প্যাঁ পোঁ করতে করতে বাড়ি ফিরত মা মামাদের সাথে।

মামারা অবশ্য মায়ের সাথে চুক্তি করে নিত যে মেলায় তারা কোনো মেয়েলি ব্যাপারে নেই। ‘এই কাঁচের চুড়ি দে রে, ল্যাবেঞ্চুস আন রে, রঙ্গীন ফিতা কিনুম, আমশি লইয়্যা ঘুরতাসে ঐ বুড়াডার কাসে চল,’ — এসব তারা সামলাতে পারবে না। তারা যাবে নদীর ঘাটে বোট রেসিং, মেলা মাঠে মোরগ লড়াই, ছোরা খেলা এসব দেখতে। সূর্য্য ঢলে এলে সবাই এসে মিলবে জনাই কাকার জিলিপি-আলুবড়া দোকানের সামনে। সেখান থেকে ধরবে বাড়ির পথ।

সন্ধ্যেবেলা গঞ্জের বাজারের দোকানে নেমন্তন্ন আছে দাদুর। দোকানদারের ছেলেমেয়েরা সব দাদুর ছাত্রছাত্রী। দাদু পাঞ্জাবী-ধুতি, সাদা চাদর পরিপাটি কাঁধে ফেলে পাম্প শু্য পায়ে ছেলেমেয়েদের নিয়েই বেরোবেন। দোকানঘরে লাল শালু মোড়া জাবদা খাতা। সিঁদূর গোলা স্বস্তিকের চিহ্ন। গ্রীল গেটে ফুল মালা, নতুন আমের পাতা। বিকেলের মিষ্টি হাওয়ায় ঝরা বকুলের গন্ধ। দাদুর কিনে দেওয়া নতুন জামা প্যাণ্ট, ফ্রক-ফিতায় সাজুগুজু করে লাইন দিয়ে পাঁচ ভাইবোনে বৈশাখী হালখাতা উৎসবে যাবে। সেখানে জুটবে আমপোড়া শরবত, রসগোল্লা আর নতুন ক্যালেণ্ডার। সাথে কখনো বা হালকা গোলাপী

মলাটের পঞ্জিকা। তাতে কি সুন্দর নতুন কাগজের গন্ধ! মেলা মাঠ থেকে উজিয়ে পা চালায় ভাইবোনেরা। ‘ম্যাজদা খোলা গলায় গান ধরেন,’ মা বলতে থাকে —

“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।
আমি বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে গো!”

কিছুক্ষণ থামে মা। তারপর খুব উৎসাহ নিয়ে বলে, ‘আহা! কি সব সোনাঝরা দিন আছিল সে সব! তুই ল্যাখবি? ল্যাখবি এসব কথা?’

হেসে বলি, ‘হ্যাঁ মা, এ বছর তোমার চোখ দিয়ে পয়লা বোশেখের শুভ মুহরত!’

বন্ধুরা, তোমাদের শুভ বৈশাখীর শুভ কামনা আর ভালোবাসা জানাই। নতুন বছর নতুন স্বাদে বর্ণে গন্ধে রঙে ও স্পর্শে তোমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় সমৃদ্ধ করুক এই কামনা রইল।

শুভ নববর্ষ!

১৪ এপ্রিল ২০১৬